Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-I, October 2020, Page No.62-80
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

গান্ধির দর্শন ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা : একটি পর্যালোচনা

Dr. Md. Ayub Mallick
Professor, Department of Political Science, KAZI NAZRUL UNIVERSITY, Bardhaman, Asansol, West Bengal (INDIA)

অহিংসা ও সত্যের ক্ষমতার প্রতি গান্ধির নিগূঢ় বিশ্বাস বর্তমান ছিল। তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন আজকেও প্রাসঙ্গিক। এক ধরনের ধর্মীয় ও আত্মিক চিন্তাধারা এই আন্দোলনের রূপ প্রদান করেছিন। তাঁর এই আন্দোলনের মূল ভিত্তি হল অহিংসা, সত্য ও নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধ : ক্রিয়া - সমঝোতা - প্রতিক্রিয়া। ভারতীয় ঐতিহ্যে বেদ, বুদ্ধের অহিংসা ও ভগবত গীতার ভাবনা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। তিনি রাজনীতি ও ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার মধ্যে কোনো বিভাজন করেননি। গান্ধির নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল হিন্দুবাদ ও সত্যের জন্য নিরুত্তর অনুসন্ধান। গান্ধির মতে, 'Hinduism is not an exclusive religion. In it there is room for worship…Hinduism tells everyone to worship God according to his own faith or Dharma and so it lives at peace with the religions.' (Gandhi 1921, p. 1059)। তাঁর মতে সত্য হল বাধ্যতামূলক, যার প্রতি আনুগত্য আবশ্যিক। সত্যি হল ভগবান। অহিংসা ও ধর্ম হল মাধ্যম যার দ্বারা আমরা সত্য অর্জন করতে পারি ও মানব জীবন সংঘবদ্ধতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তুলতে পারি। ধর্মের মাধ্যমে আমরা সার্থকভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তুলতে পারি। আমার মতে, গান্ধির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ধারণা হল সত্যযুগ সমতুল্য। গান্ধিজির মতাদর্শগত ভিত্তি হল সত্য-ধর্ম (ঋত), ধর্ম, স্ব-ধর্ম ও সমাজ-ধর্ম। কারণ, তাঁর মতে, মানুষ সামাজিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। ভগবান সৃষ্টি করেন, ধ্বংস করেন, নূতন সৃষ্টি করেন, আবার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সেটাই সত্য। মানুষেরও তাই করা উচিত সত্যের সন্ধানে। এটা আমার মতে ঠিক যে, আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ প্রস্ফূটিত হয় উচ্চমানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থেকে। তাঁর মতে, এমন কোনো ধর্ম থাকতে পারে না যা রাজনীতি বিবর্জিত হতে পারে। সঠিক ক্রিয়া ও ক্রিয়ার প্রকার ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এখানে একটি সমালোচনার বিষয় হল যে, গান্ধি কেবল মাত্র হিন্দুধর্মকে সর্বজনীন বলে আখ্যায়িত করেছেন; কিন্তু সমস্ত ধর্মের মূল কথা হল সত্য, সামাজিকতা, সহমর্মিতা। এখানে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে সংকীর্ণতা দেখা যায়।

এতৎসত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, তাঁর চিন্তাধারার সাথে লক ও রুশোর কিছুটা মিল পাওয়া যায়। তাঁর উচ্চমানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সাধারণের ধারণা ও সত্য পশ্চিমি রাষ্ট্রচিন্তায় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'মতে, 'I can say without the slightest hesitation, and yet in all humility, that those who say that religion has nothing to do with politics do not know what religion means'. (Gandhi 1949, pp. 370-71)। আবার সুইৎজার মনে করেন যে, গান্ধির রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূল ভিত্তি হল ভগবত গীতা- 'The charm of the Bhagavad Gita is due to this idea of spiritualized activity which springs

only from the highest motives'. (Schweitzer 1936, pp. 186-87)। ভারতীয় ধারণায় অদ্বৈত (non-duality) এবং অবিদ্যা (ignorance) কর্ম (action) –এর সাথে সম্পর্কিত। দেহ ও মন শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তৃতীয় শক্তি ব্রহ্ম বা আত্মা থেকে উদ্ভুত। গান্ধিজির দর্শন শুধুমাত্র ভগবতগীতা দ্বারা প্রভাবিত নয়, তাঁর দর্শন সাখ্য দর্শনের দ্বারাও প্রভাবিত। এখানে দুটি চিত্রের মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করা যায়।

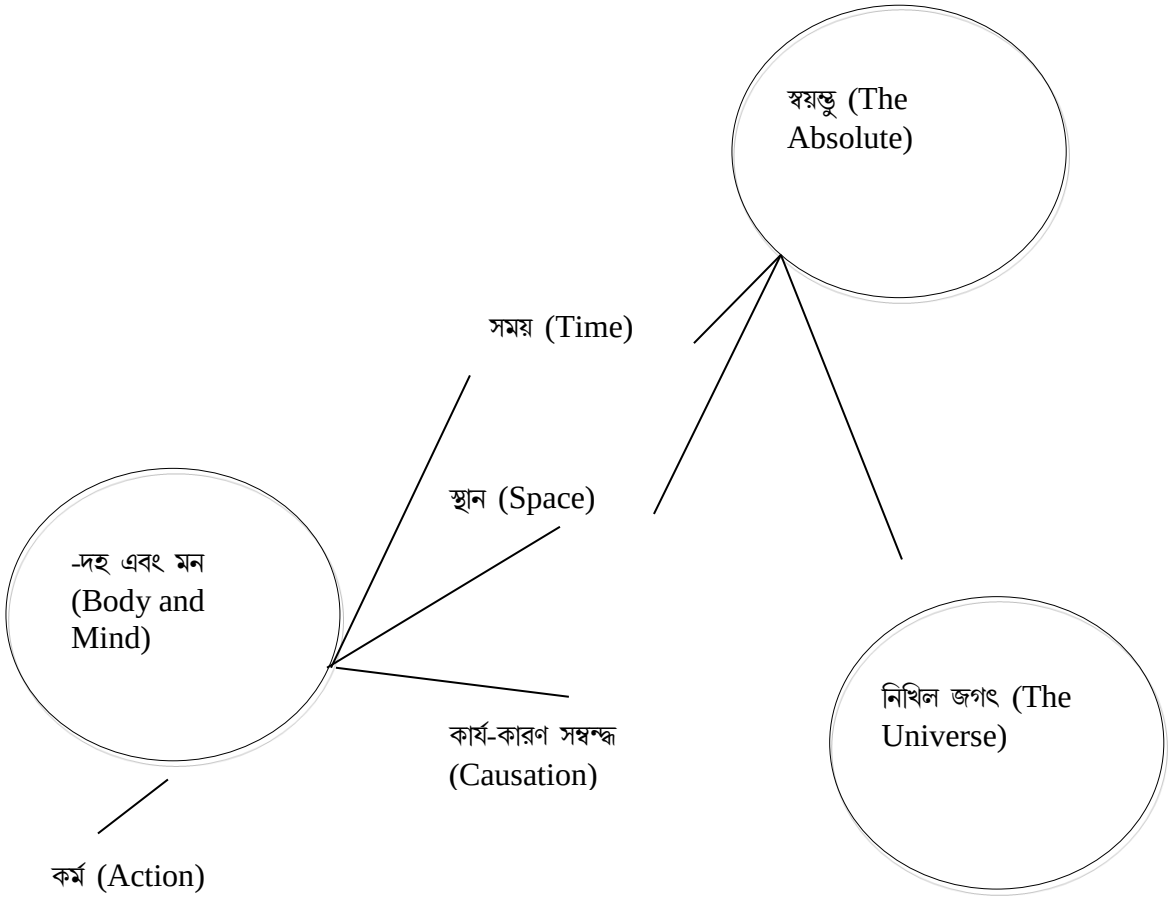

চিত্র - ১

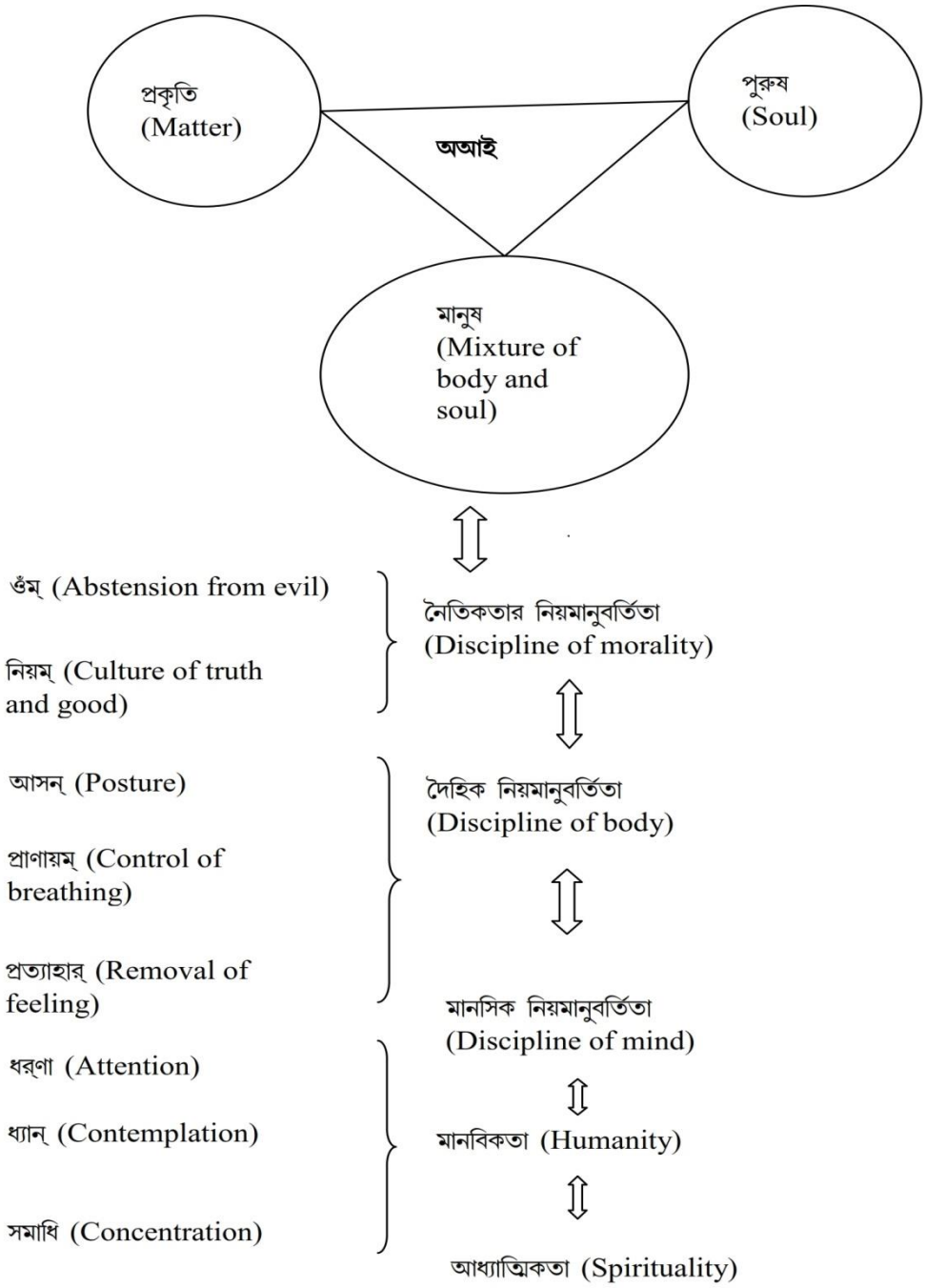
প্রকৃতি
(Matter)
পুরুষ
(Soul)
অআই
মানুষ
(Mixture of body and soul)
ওঁম্ (Abstension from evil)
নিয়ম্ (Culture of truth and good)
নৈতিকতার নিয়মানুবর্তিতা
(Discipline of morality)
আসন্ (Posture)
প্রাণায়ম্ (Control of breathing)
প্রত্যাহার্ (Removal of feeling)
দৈহিক নিয়মানুবর্তিতা
(Discipline of body)
ধর্ণা (Attention)
ধ্যান্ (Contemplation)
সমাধি (Concentration)
মানসিক নিয়মানুবর্তিতা
(Discipline of mind)
মানবিকতা (Humanity)
আধ্যাত্মিকতা (Spirituality)

চিত্র - ২

অবিদ্যা আমাদের মনে বিভিন্ন মিথ্যা ধারণা তৈরি করতে পারে। সমস্ত ধরনের বাহ্য হল উপসত্তা, যা প্রকৃত রূপ নয়। কর্ম আমাদের চেতনা কে মিথ্যায় পর্যবসিত করে; কারণ মানুষ বাহ্য রূপ ও বাস্তবতার মধ্য পার্থক্য করতে পারে না। এর কারণ হল অবিদ্যা ও রাগ বা আবেগ। 'Since doers of deeds (karmin/0 do not understand, because of passion (raga); (Hume 1921, p. 369) কর্মযোগ আত্ম-সম্পূর্ণতার পাথেয়। কর্ম আবশ্যিক ভাবে কর্মের জন্য। গান্ধি এই প্রসঙ্গে অভয় বা ভয় থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'He eho fears, who saves his skin…must fight the physical battle, whether he will or not, but that is not Dharma… Himsa (Violence) will go on eternally in this strange world. The Bhagavadgita shows a way out of it. But it also shows that the scape out of cowardice and despair is not the way. Better far than cowardice is killing and being killed.' (Gandhi 1950, p. 156)। ধর্ম হল তত্ত্ববিদ্যাগত নীতি। রাধাকৃষ্ণানের মতে, 'Dharma gives coherence and direction to the different activities of life… it is the complete rule of life, the harmony of the whole man who finds a right and just law of his living. Each man and group, each activity of soul, mind, life, and body, has its dharma.' (Radhakrishnan 1939, p. 353)। ধর্ম ও স্বধর্ম হল জীবনের ধারণা। অস্তিত্বপূর্ণ ব্যক্তি সত্য ও অহিংসার মাধ্যমে দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে। সত্য হল ভগবান, অহিংসা হল ভগবানের ভালোবাসা ও সত্য পথের দিশারি। সত্যকে অর্জন করার জন্য তিনি কতকগুলি চিরাচরিত আচরণ বিধির উল্লেখ করেছেন, তা হলঃ অহিংসা সত্য, আস্থা, অপরিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য ও তাপস বা একান্ত অনাড়ম্বরতা। অহিংসা ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি সত্যাগ্রহের জন্য প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন কর্মযোগ। সত্যাগ্রহীরা কোনো গোপনীয়তা, ষড়যন্ত্র ও কূটনীতির আশ্রয় নেবে না, বরং সত্যাগ্রহকে গণআন্দোলনের রূপ দেবে।

অহিংসা, সত্য, স্বাধীনতা ও সাম্যের দিশারি গান্ধি মনে করতেন যে, হিংসা হল শোষণের সমতুল্য, যা ব্যক্তি সম্পূর্ণতাকে অস্বীকার করে। তাঁর মতে, মাধ্যম ও উদ্দেশ্য আলদা নয়। উদ্দেশ্য ও মাধ্যম আলাদা হলে উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব নয় (Gandhi 1924)। হিংসা মানুষকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে এবং মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে অনেক পিছিয়ে দেয়। এই ধরনের হিংসা পরিপূর্ণ অসামাজিক জীবনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, মানুষ সাহায্যহীনতা, নিঃসঙ্গতা ও অপরিপূর্ণতা বোধ করে। তিনি ব্যক্তিগত হিংসা ও প্রাতিষ্ঠানিক হিংসার মধ্যে তফাৎ করেছেনঃ ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক। ব্যক্তিগত হিংসা হল একের অন্যের উপর দমন বা নিপীড়ন।

প্রাতিষ্ঠানিক হিংসার জন্মলাভ বা সূত্রপাত হয় দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও পক্ষপাতমূলক আচরণ থেকে উদ্ভুত ক্ষোভের ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হিংসার সঞ্চার ও প্রসারের নিয়ন্ত্রণ থেকে। তাই, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এমন হবে অহিংসা, সত্য ও স্বাধীনতাকে করবে (Gandhi 1920)। তাঁর মতে, সত্য চূড়ান্ত, কিন্তু জ্ঞান আপেক্ষিক; কিন্তু প্লেটো মনে করতেন জ্ঞান হল সত্য ও চূড়ান্ত, মতামত হল আপেক্ষিক। তিনি 'বাস্তবতার বহুত্ব' (manyness of reality) বিশ্বাস করতেন যা হবে সত্য উৎসারিত হতে পারে। তাঁর মতে, এই বাস্তবতার বহুত্ববাদের নীতি চূড়ান্ত ক্ষমতাকে অবদমিত করে। এখানে আমরা মিসেল ফুকোর 'ক্ষমতার অধিষ্ঠান প্রত্যেক জায়গায়' ও হেবারমাসের 'আদর্শ কথোপোকথনের পরিস্থিতি'-এর মিল পাই। গান্ধির মতে, 'If we wish to evolve the spirit of democracy out of slavery, we must be scrupulously exact in out dealings with opponents… We must concede opponents the freedom we claim for ourselves.' (Duncan 1951, p.79)। তাঁর মতে, কথোপকোথনের মাধ্যমে জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে।

ডিউই (১৯৬৬)- এর মতে, মুক্ত যোগাযোগ আমাদের অভিজ্ঞতা বর্ধন ও পরিবর্তন করে যা উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। মুক্ত আলাপ-আলোচনা আমাদের অভিজ্ঞতা ও সহিষ্ণুতাকে বর্ধিত করে। গান্ধি বলেন যে, অসহিষ্ণুতা এক ধরনের হিংসা যা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সত্তার উন্নয়নে বাধা প্রধান করে। যখন আত্মসন্তুষ্টি চুপিসারে মানুষের মধ্যে আসে তখন মানুষের উন্নয়নে বাধা আসে। গান্ধির এই ধারণাকে আমরা একটি চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারি-

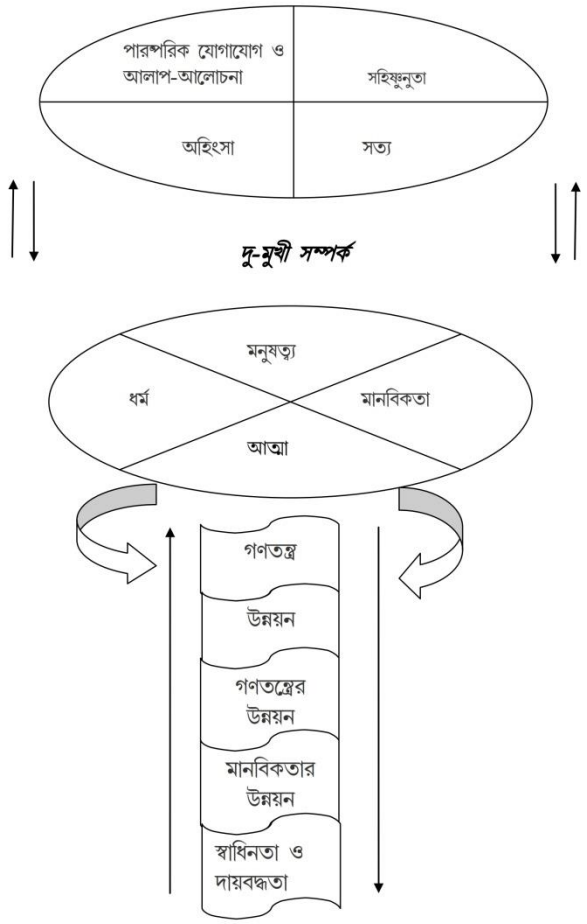

চিত্র -৩

গান্ধি রাজনীতিতে নৈতিকভাবে স্বতন্ত্র ও মুক্ত কর্মীর কথা বলেছেন। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে কোন সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। এটা খুব স্বাভাবিকভাবে মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। মন ছাড়া মানুষের কোনো অস্তিত্ব নেই। মুক্ত পছন্দ (free choice) বলতে বোঝায় যে নারী ও পুরুষ উভয়েই বাধা প্রাপ্ত হবে না দৈহিক নিপীড়নের মাধ্যমে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান হতে বঞ্চিত হয়ে। মুক্ত পছন্দ এবং কর্তব্য স্বাধীনতার সাথে যুক্ত। প্রত্যেকে তাঁর মুক্ত পছন্দের জন্য দায়বদ্ধ। আকাঙ্ক্ষা, অনাকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ মানুষের প্রাকৃতিক চাহিদা। বাধার অনুপস্থিতিই হল স্বাধীনতা। কিন্তু, নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতাও কাম্য নয়, যা নৈরাজ্যের পরিস্থিতি টেনে আনতে পারে, যা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খণ্ডন করে।

গান্ধির মতে, ব্যক্তি স্বাধীনতা খণ্ডন হতে পারে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় শাসন ও নিপীড়ন থেকে নয়। এছাড়াও, অর্থনৈতিক অসাম্য, শিল্পায়ণ থেকে উদ্ভুত বেকারত্ব ও আনুষ্ঠানিক সামাজিক সম্পর্ক, জাত ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতা এবং উপনিবেশিকতা এসব স্বাধীনতাও স্বাতন্ত্র্য খণ্ডনের কারণ। স্বাধীনতা সামাজিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। তাঁর মতে, অধিকারের বিনিময়ে মানুষের প্রয়োজনকে বিসর্জন দেওয়া যায় না। মানুষের কাজের চাহিদা সব থেকে মূল্যবান। কাজের অধিকার মানুষকে স্বাধীনতা, অনির্ভরশীলতা ও স্বাতন্ত্র্য দিতে পারে। তিনি মনে করতেন যে, আমি কোনো উলঙ্গ ব্যক্তিকে বস্ত্র দান করে তাঁকে অপমান করব না, কাজ দেওয়ার পরিবর্তে, যা তাঁর প্রয়োজন (Unger 1965 and Bose 1948)। তিনি মনে করতেন যে, বাজার কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান সমূহ মানুষের স্বাধীনতা হনন করে, মানুষের চাহিদাকে প্রসারিত করে এবং নৈতিক কর্মী হিসাবে ভূমিকাকে অপসারিত করে (Gandhi 1927)- এর ফলে কর্ম ও নৈতিকতা- এর মধ্যে কোনো যোগাযোগ ও মেলবন্ধন পাওয়া যায় না। পশ্চিমীয় স্বাধীনতা চিন্তাকে গান্ধিজি গ্রহণ করেননি। প্রত্যেক কর্তব্য কিছু অধিকার প্রদান করে থাকে, আবার প্রত্যেক অধিকার কিছু আনুগত্যের কথা বলে। আসলে কর্তব্য ও অধিকার অবিরাম ভাবে চক্রাকারে আবর্তিত। আবার তিনি দায়বদ্ধতার সাথে আনুগত্য ও অমান্যতাকে যুক্ত করেছেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমাদের কর্ম সর্ম্পকে সচেতন হওয়া উচিত। মানুষ তখনই মুক্ত হবে যখন সে নিজের কর্মের প্রতি দায়বদ্ধ হবে। তাঁর মতে, অনেক মানুষ জটিল সরকারি ব্যবস্থা বোঝেন না। এই অজ্ঞতা স্বাধীনতা খণ্ডন করে। অনেক নাগরিক অজ্ঞানতা হেতু নিঃশ্চুপে সরকারকে টিকিয়ে রাখে। তাই জ্ঞানের প্রয়োজন। সেই হেতু, প্রত্যেক নাগরিক তাঁর সরকারের প্রত্যেক কাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। সরকারের প্রতি সমর্থন বজায় রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারকে সহ্য করা যাবে, অন্যথায় সমর্থন প্রত্যাহারিত হবে (Gandhi 1929, 1920)। তিনি সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাস করতেন না। প্রত্যেক ব্যক্তি কর্মের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত থাকবে, আর এতেই স্বাধীনতা ও মুক্ত পছন্দের পরিবেশ আসবে।

স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও আলাপ-আলোচনা গান্ধির চিন্তা ধারার মূল কেন্দ্র ছিল। সমাজের অসাম্য মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, তাঁদের সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যেও তফাৎ দেখা যায়। এর ফলে সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ও সমর্মিতা, অন্যের দুঃখ ও কষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও মতামত,স্বার্থ ও ইচ্ছা বোঝার ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং সেই কারণে কথোপকথন (diaohue)-এর কোনো গুরুত্বই থাকে না। সাম্য বলতে চুড়ান্ত অর্থনৈতিক সাম্যকে বোঝায় না, যাহা প্রত্যেকের জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য হবে। পার্থক্য থাকবে; কিন্তু প্রত্যেকের নিজের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের মতো প্রাচুর্যতা থাকবে। এখানে আমরা লকের সাথে মিল পাই। তিনি সমাজতান্ত্রিক সাম্যের কথা বলেননি যেখানে সমস্ত সম্পত্তির সরকারি মালিকানা ও ক্ষমতা ও শাসনের কেন্দ্রিকতার কথা বলা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করে (Gandhi 1946 and Tendulkar 1951-54)। চূড়ান্ত পার্থক্য নয়, সীমিত পার্থক্য মানুষের দায়বদ্ধতাকে উন্নত করে ও কথোপকথনের পরিস্থিতিকে আরো বাড়িয়ে তোলে। এখানে আমরা তাঁর মতের সাথে রুশোর মিল ও মার্কসের সাথে পার্থক্য লক্ষ্য করি। এমন কোনো ধনী থাকবে না যে অন্যকে ক্রয় করার ক্ষমতা রাখবে এবং এমন কোনো গরীব থাকবে না যাকে বাধ্য করা হবে নিজেকে অন্যের কাছে বিক্রয় করতে। শ্রম হলো ঐক্যবদ্ধকরণ ও সাম্য প্রতিস্থাপনের এক বড় হাতিয়ার। গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমরা অহিংসা, সত্য ও স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পৌছাতে পারি। গান্ধির মতে, সাম্য,স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র- এর মধ্যে সম্পর্ককে একটি চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারি।

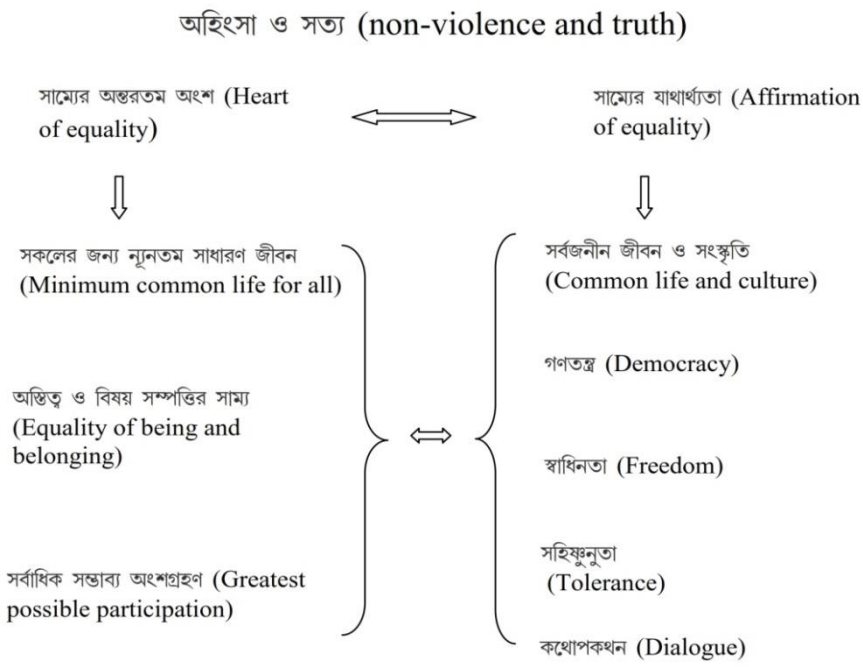

চিত্র - ৪

গান্ধি বহুত্ববাদে বিশ্বাস করতেন; কিন্তু তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, তা সর্বজনীন। তাঁর মতে, আধুনিক গণতন্ত্র হল প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন ও বহু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সমন্বয়। তিনি আধুনিকতা বর্জিত গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। তিনি বাজারি রাজনীতিকে পছন্দ করতেন না। জোসেপ (১৯৫০) যে ভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন গান্ধি সে ভাবে বলেননি। গান্ধির প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ছিল না। যদিও তিনি বহুত্ববাদী মতামতে বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু তিনি আপেক্ষিকভাবে স্বতন্ত্র্য গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিবেশের কথা বলেছিলেন। গান্ধি প্রাদেশিক অবস্থাভূক্ত সম্প্রদায় ও সমষ্টি স্বার্থের কথা বলেছেন। উদারনৈতিক বহুত্ববাদী চিন্তার সাথে গান্ধির তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। উদারনৈতিক চিন্তাধারায় রাজনীতি বলতে সম্পদের অপ্রতুলতা, বহু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থ, স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ ও দ্বন্দ নিরসনের উপায়। এখানে স্বার্থ হল প্রাকৃতিক যা ব্যক্তি স্তর থেকে উঠে আসে এবং ঐক্য হল স্বয়ংক্রিয়। উদারনৈতিক বহুত্ববাদে দ্বন্দ সমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমাদের আদান-প্রাদান ও আপোষ- মীমাংসার রাজনীতির দিকে নিয়ে যায়। গান্ধি এই প্রকার বহুত্ববাদে বিশ্বাস করতেন না। তিনি এক ধরনের সামাজিক জীবনের কথা বলেছেন যেখানে বিশ্বাস, স্বাধীনতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও স্বয়ংক্রিয়তা থাকবে। প্রয়োজন ও স্বার্থের মধ্যে তিনি তফাৎ করেছেন। তিনি উদারনৈতিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর রাজনীতি পছন্দ করেন নি। নানাবিধ ও কলহমূলক স্বার্থসমূহ যাতে কমানো যায় তার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্রে বিন্যস্ত করা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বাইরে ও ভিতরে বিভিন্ন স্বার্থ সমূহের দ্বন্দের সমাধানের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন স্বার্থের উদ্ভুতিকরণের বিভিন্ন ধরনের কারণ সমূহ যথাসম্ভব নির্মূল করা। এর জন্য প্রয়োজন

হল স্বাধীনতা ও ন্যায়তান্ত্রিক রাজনৈতিক শৃঙ্খলা। সনাতনী প্রজাতান্ত্রিক তথ্যে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিভিন্ন স্বার্থের ভূমিকা বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন; যেমন সিসেরো, ম্যাকিয়াভেলী এবং রুশো প্রত্যেকেই অহংবোধ-বিবর্জিত রাজনীতির কথা বলেছেন। রুশো যেমন সাধারণ ও ক্ষুদ্র সমাজের কথা বলেছেন, তেমন অন্যান্যরাও ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে সাধারণের স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন সমাজ বা নাগরিক সমাজের প্রয়োজনীয়তার জন্য বা ঐ সমাজের সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য। প্রজাতান্ত্রিক তাত্ত্বিকরা মনে করতেন যে, স্বাধীনতা সুরক্ষিত হতে পারে যদি জনগণ শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ বিবর্জিত হয়। সেই হিসাবে প্রজাতান্ত্রিক তাত্ত্বিকরা মনে করতেন যে, স্বাধীনতা আমরা ফিরে পেতে পারি যদি ক্ষমতার বিভিন্নকরণ (যেমন ফুকো বলেছিলেন যে, ক্ষমতার অবস্থান প্রত্যেক জায়গায়), সহযোগিতার প্রতিষ্ঠানিকিকরণ, জনসাধারণের প্রতি সেবা প্রদানের উপর গুরুত্ব দান এবং বিস্তৃত জন অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব দান। সীমাহীন ব্যক্তি স্বার্থকে অবশ্যই বাধা দেওয়া উচিত। উদারনৈতিক প্রজাতান্ত্রিক তত্ত্বে ও প্রারম্ভিক আমেরিকান গণতান্ত্রিক তত্ত্বে মুক্ত ও পূর্ণ অংশগ্রহণ, স্বাতন্ত্র ও অনির্ভরশীলতা হল গণতন্ত্রের ভিত্তি। নির্ভরশীলতা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে মূল ভিত্তি। আর এই নির্ভরশীলতা গড়ে ওঠে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য। তাই গান্ধির মতে, কার্যকরী গণতন্ত্রের প্রাক্ শর্তাবলী হল সঠিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক। তাই তিনি গ্রামীণ গণতন্ত্রের পূর্ব শর্ত হিসাবে খাদি উদ্যোগ বা চড়কার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এর মাধ্যমে সমাজের প্রত্যেকে নিজের কল্যাণ ও স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি করতে ও নির্ভরশীলতা কমাতে পারে। প্রারম্ভিক গণতান্ত্রিক তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষমতা উপর নির্ভরশীলতা সমস্যা তৈরি করতে পারে; কারণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাজনৈতিক ক্ষমতায় পর্যবসিত হয়, যা গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।

রুশোর মতো অনেক প্রারম্ভিক গণতান্ত্রিক তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, আধুনিকতা পুরাতন প্রতিষ্ঠান সমূহকে ধ্বংস করে, অসাম্যের সৃষ্টি করে, নূতন করে নির্ভরশীলতা তৈরি করে-এই সমস্ত গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক। গান্ধি ও আধুনিকীকরণ ও শিল্পায়ণের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর মতের সাথে রুশোর মতের মিল পাওয়া যায়।

গান্ধির গণতন্ত্রের ধারণা কোন প্রতিষ্ঠানিক বিকল্প নয় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদের। তিনি এমন ধরনের সরকারি ব্যবস্থার কথা বলেছেন যেখানে ব্যক্তি সম্পূর্ণতা এবং বহুত্ববাদ থাকবে, যা অহিংসাকে উদ্বুদ্ধ করবে। তিনি রাজনীতিকে সাধারণীকৃত ও গণতন্ত্রকে বিশেষীকৃত করেছেন। হিংসা সরকারি ব্যবস্থার বৈধতা ও আনুগত্য আসতে পারে না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য রাজনৈতিক অসাম্যকে প্রসারিত করে। তাই রাজনৈতিক নেতৃত্বের উচিত তাকে নিয়ন্ত্রণ করা। দ্বন্দের পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের উচিত তাকে নিয়ন্ত্রণ করা। দ্বন্দের পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব অহিংসা ও সমঝোতার পথ অনুসরণ করবে। আধুনিক গণতন্ত্রের সমস্যা রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক ও বিতরণমূলক দিকগুলি। গণতন্ত্রের ভবিষ্যত রক্ষার ব্যাপারে ব্যক্তির ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৃহত্তর সমাজ ও সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে দায়বদ্ধতা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্য কোনো পৌরসমাজের লক্ষণ নয়। রাজনৈতিক সমাজ পৌরসমাজের বিপরীত। রাজনৈতিক সমাজ শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ ও সুবিধা লাভের জন্য দ্বন্দ। তাই গান্ধি গ্রাম ভিত্তিক পৌরসমাজের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতেন। গান্ধি এক ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মনস্তত্বের কথা বলেছেন যেখানে দায়বদ্ধতা প্রত্যেকের আবশ্যিক। গান্ধি এমন সমাজ বলেছেন যেখানে থাকবে সাধারণের পৌরসমাজ এবং পৌরসমাজের প্রতি ব্যক্তি দায়বদ্ধতা।

পূর্ণ স্বরাজ বা অখণ্ড গণতান্ত্রিক পরিসর শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বর্তমান। আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্রে অবক্ষয়ের যুগে যা প্রয়োজন তা হল দীর্ঘ বিপ্লব যার মূল লক্ষ্য হবে বর্তমান সমাজ কাঠামোকে নূতন করে তৈরি করা। হেবারম্যাস (১৯৭৫) ও ওলিন (১৯৮১) একই বক্তব্যের অনুসারী ছিলেন। গান্ধি এই গণতন্ত্রকে নূতনভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে পূর্ণ স্বরাজ (integral democracy) রামরাজ্য (sovereignty of the people based on pure moral authority) ও সর্বদয় (a social order promoting the good of all) ইত্যাদির কথা বলেছেন (Gandhi 1938)। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে বিরোধ, ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি পরিসর ও সরকারি পরিসরের মধ্যে বিরোধ নিরসনের হিসাবে তিনি স্বরাজ (self-rule and self-restraint) – এর কথা বলেছেন সত্যাগ্রহ (search for truth) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। গান্ধি পশ্চিমী ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে ছিলেন। হেমারম্যাস (১৯৭৮) যেমন ভাবে পরবর্তী পুঁজিবাদী সমাজের বৈধতার সঙ্কটের কথা বলেছেন, ঠিক তেমনই ভাবে আধুনিক পশ্চিমী ধ্যানধারণা নস্যাৎ করেছেন। পরবর্তী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক বৈধতার অসত্য দাবি গান্ধি অনেক আগেই দক্ষিণ আফ্রিকার ও ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে বলে গিয়েছিলেন, যা হেবারম্যাসের মতে বৈধতার সঙ্কট। ব্যক্তিগত সম্পত্তি আহোরণ ও তার অধিকার বজায় রাখার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ উপনিবেশিক সমাজ ও পরবর্তী উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট। এই ধরনের রাষ্ট্র সর্বজনের সর্বাধিক ভাল (Gandhi 1961) ও জনগণের সাধারণিকৃত স্বার্থসংকলন (Habermas 1970) সম্বন্ধে সম্পর্কিত নয়। হেবারম্যাসের মতে, 'Genuine participation of citizens in the proceses of political will- information, that is, substantive democracy, would bring to consciousness the contradiction between administratively socialized production and the continued private appropriation and the use of surplus value,' (Habermas 1970)। পুঁজিবাদি ধ্যানধারণা ও উপযোগিতামূলক নীতি সমূহ অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। গণতন্ত্রের যুগ হল গরীব থেকে গরীবতর মানুষের নিষ্ক্রিয়তা ভঙ্গের যুগ। বর্তমান যুগের গণতন্ত্র সর্বব্যাপি নিয়ন্ত্রণকারী শাসন। যদি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক হতে হয় তা হলে তাকে অহিংস হতে হবে। গণতন্ত্র ও হিংসা একি সাথে চলতে পারে না, কারণ হিংসা দুর্বল শ্রেণির মানুষদের রক্ষা করতে পারে না বা তাঁদেরকে কিছু প্রদানও করতে পারে না, যেখানে প্রকৃত গণতন্ত্র দুর্বল শ্রেণির মানুষদের সমান সুযোগ প্রদান করে যেমন শক্তিশালী বা প্রভাবশালীরা ব্যবহার করে থাকে। ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদ হল নগ্ন, অসভ্য। সভ্যতা হল ভাল আচরণ। তাঁর মতে ইউরোপ ও আমেরিকার র্নিবাচন সংক্রান্ত গণতন্ত্র হল নামমাত্র গণতন্ত্র এবং ফ্যাসিবাদের মত সমান প্রজাতির, যেখানে শোষণ ও শাসনমূলক ব্যবস্থা বর্তমান থাকে এবং সেখানে স্বার্থ ও লক্ষ্য চরিতার্থ করার করার জন্য নির্মমতাকে প্রয়োজন মত ব্যবহার করা হয়। কিন্তু, গান্ধি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে একটা তফাৎ করেছেন, যা হল গণতান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিকতা হল সংগঠিত। এখানে জনগণ মনে করে যে সরকারের বক্তব্য আমাদের বক্তব্য। এটাই হল বৈধতার সঙ্কট। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় সবটাই অসংগঠিত (Gandhi 1961, 1942, 1954)। সবটাই উলঙ্গ। এই ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় বলেছিলেন, 'The people of Europe have no doubt political power but no Swaraj. Asian and African races are exploited… under the sacred name of democracy … the exploitation of Europe is sustained by violence…My notion of democracy is that under it the weakest should have the same opportunity as the strongest. Western democracy as it functions today is diluted Nazism or Fascism… Under the outlook, multiplicity of material wants will not be the aim of life, the aim will be rather their restriction consistently with comfort. We shall cease to

think of getting what we can, but we shall decline to receive what all cannot get.' (Gandhi 1961, pp. 78, 9, 76-77, 11)। গান্ধির মতে, উত্তর-পুঁজিবাদী সামাজিক শৃঙ্খলার অঙ্গ হিসাবে সত্যিকারের গণতন্ত্রে যে অসাম্য বর্তমান থাকে তা মালিকানা, অমালিকানা, জাতি, ধর্ম ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে নয়। 'Trusteeship provides a means of transforming the present capitalist order of society into an egalitarian one. It gives no quarter to capitalism,… It does not recognize any right of private ownership of property, except inasmuch as it may be permitted by society for own welfare.' (Pyarelal 1958,pp. 633-34). অছি ধারণার সাথে গান্ধির সর্বদয়ের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ এখানে উপযাগিতাবাদীদের মত শুধুমাত্র দৈহিক সুখ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলা হয় নি, বরং সমাজের জন্য ব্যক্তির আত্ম-বলিদানের কথা বলা হয়েছে। মানুষের প্রকৃত নীতি হল সকলের সর্বোচ্চ মঙ্গল, যা সর্বোচ্চ আত্মবলিদানের মাধ্যমে সম্ভব (Desai 1953)। গান্ধি তাঁর গণতান্ত্রিক তত্ত্বে বিশেষ কোনো শ্রেণির উপর আক্রমণ করেননি, তাঁর আক্রমণের মূল জায়গা হল অনৈতিক ও নিপীড়নমূলক রাষ্ট্র। তিনি পুঁজি ও শ্রম, জমিদার ও ভূমিহীন- এর মধ্যে দ্বন্দকে গুরুত্ব দেন নি, বরং তাঁর মতে যদি পুঁজিবাদ ও জমিদারী ব্যবস্থাকে সঠিক ভাবে নির্বীজিত করা যায়, তা হলে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রেণি দ্বন্দকে অতিক্রম করা যাবে (Gandhi 1954, pp. 95-127). তিনি বলেছেন যে, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় মূল দ্বন্দ হল ব্যক্তি ও রাষ্টের মধ্যে দ্বন্দ যার মাধ্যমে হিংসা কেন্দ্রিভূত ও সংগঠিত আকারে প্রকাশ পায়। সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানা থেকে উদ্ভুত হিংসা রাষ্ট্রীয় হিংসার থেকে অনেক কম ক্ষতিকারক। তিনি মনে করতেন যে, হিংসার মাধ্যমে রাষ্ট্র নিষ্পেষিত পুঁজিবাদ কাম্য নয়, কারণ তা হিংসাকে আরও প্রসারিত করে, যা বিদ্বেষপূর্ণ ও দূষিত হিংসা ও শোষণকে ভাঙতে পারে না বরং বর্ধিত করে (Gandhi 1954, pp. 74, 92)।একিই ভাবে হেবারম্যাস (১৯৭৫) মনে করতেন যে, রাষ্ট্র পরিচালিত পুঁজিবাদ অবশ্যই আংশিক শ্রেণি সমঝোতা করবে। হেবারম্যাসের মতে, 'State-regulated capitalism, which emerged from a reaction against the dangers to the system produced by open class antagonism, suspends class conflict.' (Habermas 1970, p. 107) । গান্ধির সংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় হিংসার প্রতি যে অভিযোগ তার মূল ভিত্তি হল ব্যক্তি স্বাধীনতা। ব্যক্তিকে যদি হিসাবের মধ্যে ধরা না হয়, তা হলে সমাজের অস্তিত্ব কোথায়?- গান্ধি এই মতই পোষণ করতেন (Gandhi 1942, p. 27)। তিনি উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জন পরিসর ও ব্যক্তি পরিসর এর মধ্যে বিভেদ ও দ্বন্দ সমর্থন করেননি। প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তিস্বার্থ ও জনস্বার্থ বিভেদমূলক ও দ্বন্দমূলক নয়। রাজনৈতিক শাসকগণ বা প্রতিনিধিগণ অবশ্যই রাজনৈতিক সত্তা ও ব্যক্তি সত্তা উভয়েরই সংকলন করে চলবে (পেটম্যান ১৯৭৫)। 'The liberal answer to the problem of social order inherent in such a society was to divide social life into spheres and to substitute for shared principles a 'political method' or procedure for arbitrating between the conflicting individual interests and deciding on the "public interest" '(Pateman1975, p. 451)। গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিরা জনস্বার্থকেই প্রতিনিধিত্ব অরে, তাই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত পদ্ধতিগত ভাবে মূল্য নিরপেক্ষ। সমানভাবে, রাজনৈতিক পদ্ধতি হল অনৈতিক। কিন্তু, অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, নাগরিক ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক পৌর সমাজের সদস্য সমূহের মূর্ত প্রকাশ। উদারনৈতিক রাজনীতিতে রাজনৈতিকতার বাস্তবীকরণ রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে সম্ভব এবং ক্ষমতা প্রয়োগকারী দ্বারা বেসসরকারিকরণ ও ক্রমোচ্চস্তরবিন্যাসকরণ অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে এবং পুঁজি সঞ্চয়ে রাষ্ট্রের সমর্থন ও প্রসারিত করে (Fay 1975)।

এই ধরনের উত্তর আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মানুষের ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে যা সমস্ত প্রগতির মূল। রাষ্ট্র হল হৃদয়হীন যন্ত্র এবং অনৈতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এর থেকে মুক্ত পাওয়া যেতে পারে যদি স্বরাজ ও সত্যাগ্রহ এবং রাজনীতি ও নৈতিকতা কে সম্মিলিত রুপ দেওয়া যায় (Burnham 1978 and Gandhi 1954)। গান্ধির মতে, প্রকৃত গণতন্ত্রকে সাফল্যে পর্যবসিত করতে হলে প্রত্যেক গ্রামের নিম্নবর্গের মানুষের অংশগ্রহণ প্রয়োজন (Gandhi 1961)। তাঁর মতে, 'The very essence of democracy is that every person represents all the varied interests which compose the nation…True democracy cannot be worked by twenty men sitting at the Centre. It has to be worked from below by the people of every village. '(Gandhi 1961, p.7)। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে অগ্রাহ্য করা যায় না, কিন্তু তা যেন পশ্চিমীয় গণতন্তের ধাঁচে না হয়, যেখানে মানুষ রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র জন সদিচ্ছাকে বহন করবে তাকে ক্ষমতার মাধ্যমে দমন করবে না। গণতন্ত্র নিঃস্ফল হতে বাধ্য যদি না ক্ষমতাকে সবার মধ্যে ভাগ করে না নেওয়া যায়। জনগণকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিকৃত করতে হবে। প্রকৃত স্বরাজ আসতে পারে গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাতে করে তারা তাদের সামর্থ্য বুঝতে পারে কি ভাবে কতৃত্বকে পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাঁর মতে, কতৃত্ব কাঠামো পিরামিডের মতো ক্রমোচ্চস্তরে বিন্যস্ত হবে না, যার প্রকার হবে সমুদ্রের ঢেউ- এর মতো, যার মূল কেন্দ্র হবে ব্যক্তি। 'In this structure composed of innumerable villages, there will be ever-widening, never-ascending circles… But it will be an oceanic circle whose center will be the individual always ready to perish for the village… but ever humble, sharing the majesty of the oceanic circle of which they are integral units.' (Gandhi 1961, pp. 73-74)। একটি চিত্রের মাধ্যমে এটিকে ব্যাখ্যা করা যায়।

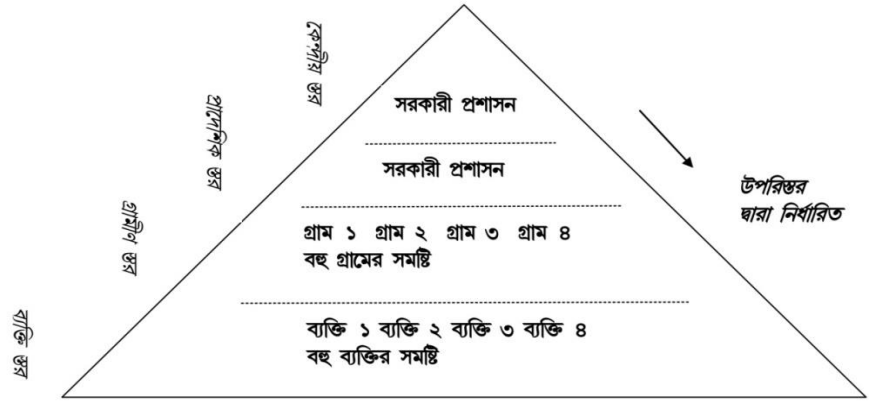

চিত্র - ৫

অপ্রকৃতস্ত গণতন্ত্র

অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জনের কথা বললেও গান্ধি সামাজিক শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের কথা বলেছেন। উদারনৈতিক গণতন্ত্র কোনো দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যবদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে শাস্তির ভয় সামাজিক সমন্বয় গড়ে তুলতে পারে না। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক ঐক্য দুই গড়ে উঠতে পারে রাজনীতির আধ্যাত্মিকরণ, রাজনীতি ও নৈতিকতার সুসংবদ্ধকরণ,

সামাজিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ, কথোপকথন, আত্মশিক্ষণ, আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংযম- এর মাধ্যমে (Gandhi 1956)। সেই কারণে গান্ধি মনে করতেন যে, সত্যগ্রহের মাধ্যমে আমরা আধুনিক, অনৈতিক ও প্রবর জাতীয় বা প্রকৃতির সরকারকে প্রতিহত করতে পারি। সত্যাগ্রহ হল কর্মের অনুশীলন। তাঁর মতে, ধর্ম ও কর্ম একাই সাথে চলে। প্লেটোর ন্যায়ের মত গান্ধির মতে, স্বরাজ হল বর্গক্ষেত্রীয়। একটি চিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো

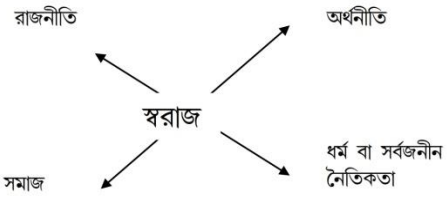

নৈতিকতা হল মানবজাতির মঙ্গল। 'The highest moral law is that we should unremittingly work for the good of mankind.' (Gandhi 1922, p.7). মানবজাতির মঙ্গল করতে হলে আমাদের সত্যিকারের নীতিক হতে হবে। তাঁর মতে, সমাজবাদ ও সাম্যবাদ –এর কিছু ধারণা আমাদের থেকে পৃথক। কান্টের মতে, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার মূল সমস্যা হল 'the powers of each selfish inclination… man is forced to be a good citizen even if not a morally good person.' (Kant 1963, p. 112). গান্ধি (Gandhi 1961) বলেছেন যে, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে আমরা সত্যের সঠিক বিচারক হতে পারি না। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উভয়ই গণতান্ত্রিক বৈধতা ও সমাজের জন্য আবশ্যিক। অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজের ও গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক। তিনি এমন সত্যের কথা বলেছেন যেখানে সমষ্টি স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং এর উপর ভিত্তি করেই তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথা বলেছেন। এখানে তিনটি উপায়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব – (১) বিরোধী বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে শোনা ও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তাদের রাজি করানো বা মতানুবর্তী করে তোলা। (২) বিরোধী মতাদর্শীদের আবেদন করা যাতে তারা সত্যাগ্রহীদের দুঃখ-কষ্টের অনুসারী হতে পারে। (৩) অসহযোগিতা ও আইন অমান্য। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মূল পদ্ধতিগুলো হলঃ (১) শুদ্ধিকৃত ও সম্ভাব্য কর্মপ্রক্রিয়া, যেমন আবেদন, নিবেদন ও অনশন; (২) অসহযোগিতার কর্মপ্রক্রিয়া, যেমন বয়কট, ধর্মঘট ও হরতাল ইত্যাদি; (৩) আইন আন্দোলন, যেমন পিকেটিং, কর না প্রদান ও বিশেষ আইন অমান্য করা; এবং (৪) গঠনমূলক কর্মসূচির জন্য কর্মপ্রক্রিয়া, যেমন আন্তঃসাম্প্রদায়িক ঐক্যের উন্নয়ন, অস্পৃশ্যতার অপসারণ, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার প্রসার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্যের অপসারণ। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মূল ভিত্তি হল অহিংসা, সত্য, সমাজে মানুষের প্রয়োজনীয়তার সম্পূর্ণতা এবং ঐক্যমতের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান। (Bondurant 1959)। আচরণের স্বর্ণালী নিয়ম হল পারস্পরিক সহিষ্ণুতা। আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য থাকবে, বিভিন্ন ধরনের মতামত থাকবে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মতামত থাকবে এবং চেতনাও ভিন্ন প্রকারের হবে। চেতনার স্বাধীনতা প্রত্যেকের আছে (Gandhi 1926)। হিংসার উৎপত্তি হয় অসহিষ্ণুতা থেকে। আমরা যদি অন্যের অনির্ভরশীলতার অধিকার, চিন্তা-ভাবনার ও মানসিকতার স্বাধীনতাকে গুরুত্ব প্রদান না করি, অসহিষ্ণুতাকে ছাড়তে না পারি, তা হলে হিংসাও আমাদের পিছু ছাড়বে না।

মানব জীবনে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা হল মানব জীবনের ধর্ম; যেমন হিংসা ও যুদ্ধ। হিংসা হল জঙ্গলের ধর্ম। যুক্তি- তর্ককে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি দুঃখ-কষ্ট ভোগ ও আত্মসংযমের মাধ্যমে। যুক্তিকে কষ্টের

মাধ্যমে অর্জন করতে পারি। সত্যাগ্রহীদের কাছে সত্যতা, সততা ও সাহসিকতা দুঃখ ও কষ্ট অর্জনের মাধ্যমেই সম্ভব। সত্যাগ্রহীরা যদি বিরোধী পক্ষের কাছে তাদের দুঃখ-কষ্ট প্রদর্শন করতে পারে, তবে এটা সত্যাগ্রহীদের কাছে একটা বড় সুযোগ জয় লাভ করার (Gandhi 1961, 1925)। শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করা হল মনুষ্য প্রজাতির অভিজ্ঞান, তরবারি বা কোনো অস্ত্র না (Gandhi 1932)। শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ হল সত্যাগ্রহীদের সত্যনিষ্ঠা ও সাহসিকতার প্রমাণ। অহিংসা পথের দিশারিরা আত্মবলিদানের সামর্থ্যকে উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার মত উচ্চ পরিস্থিতিতে পৌঁছানোর জন্য। যে ব্যক্তি ভয়কে জয় করতে পারবে না, সে অহিংসার পূর্ণাঙ্গ রূপ অনুসরণ করতে পারবে না (Gandhi 1940, op. cit. Morris-jones 1970)।

অনেকের মতে, গান্ধির মতানুযায়ী অহিংসা, আত্মসংযম, দুঃখ-কষ্ট ভোগ ইত্যাদির মাধ্যমে হিংসার রাজনীতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। এই বাস্তব জগতে মানব জীবন অতিবাহিত করতে হলে সাধু-সন্ত প্রকৃতির জীবন ধারণ সম্ভব নয় (Orwell 1949)। নৈতিকতা ও রাজনীতি এই দুটিকে সম্পূর্ণ আলাদা করা যায় না। বাস্তব রাজনীতি ও ব্যক্তি নৈতিকতা আলাদা। এই প্রসঙ্গে মোরিস্-জোনস্ (১৯৬৩) এবং রজনী কোঠারী (১৯৭০)-এর বক্তব্য সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যা প্রাসঙ্গিক। মোরিস্-জোনস্ ভারতীয় সংস্কৃতিকে তিন প্রকার বৈশিষ্ট্যমূলক প্রকাশভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন- সনাতন, আধুনিক ও সাধু-সন্ত প্রকৃতির। তিনি মনে করেন যে, ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বকীয়তার নিদর্শন সমূহ প্রকৃতপক্ষে হল বৈশ্লেষিক সাধারণীকরণ (analytical generalization), যা অপ্রমাণিত (unproved) ও স্থূল (gross) প্রকৃতির। এই সংস্কৃতির মধ্যে যে বিষয়গুলো বর্তমান সেগুলো হল বিমূর্ত নমনীয়তা (ideological flexibility), নৈতিক আপেক্ষিকতার (ethical relativism), অনিশ্চয়তার সহনশীলতা (tolerance of ambiguity) এবং নৈতিকতার ভাবনা ইত্যাদি। কোঠারির মতে, কয়েক দশক ধরে ভারতে আমরা ব্যপক অর্থে সম্মতি ভিত্তিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির চিত্র দেখতে পাই, যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও কার্যক্রম সম্পর্কে মৌলিক বা বুনিয়াদি সম্মতি, সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি এবং পবিত্রতা বোধ ও বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব।

গান্ধির মতে, গৌতম বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে কোনো সরকার সম্পূর্ণরূপে অহিংস হতে পারে না, কারণ তা সকল জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু, আমি প্রভাবসম্পন্ন অহিংসা সমাজের কথা বিশ্বাস করি। এবং আমি এর জন্য কাজ করে চলেছি (Gandhi 1959)। এই প্রসঙ্গে ইনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথা বলেছেন, অহিংসা ও হিংসার, অদৃশ্যমানতা (invisibility) ও দৃশ্যমানতা (visibility)- এর সমীকরণের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হিংসাশ্রয়ী প্রতিরোধের বিপরীতে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তিন চতুর্থাংশ অদৃশ্যমান ও এক চতুর্থাংশ দৃশ্যমান। যা দৃশ্যমান তা অন্তিম ফলাফলের নীরিখে কার্যকরী নয়, কিন্তু যা অদৃশ্যমান তা অন্তিম ফলাফলের নীরিখে সক্রিয় এবং কার্যকরী। হিংসাশ্রয়ী মানুষের কার্যকলাপ দৃশ্যমান হয় যতক্ষণ তা স্থায়ী হয়, কিন্তু তা সব সময় অচিরস্থায়ী। বুদ্ধের অহিংস কার্যকলাপ সময় ও ব্যবহারের পৌণপুনিকতার সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে (Gandhi1942)। উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই সমাজের গণতান্ত্রিক জন্য সত্যাগ্রহ একটি কার্যকরী পন্থা। অহিংসা প্রশিক্ষণ জনগণের নৈতিকতার মান বৃদ্ধি করে। 'The non-violence of my conception is a more active and more real fighting against wickedness than retaliation whose very nature is to increases wickedness.'(Gandhi 1942, pp. 22-23)। এই মতের সমর্থনে হাক্সলে (১৯৪৬) বলেছেন যে, সত্যাগ্রহ পশ্চিমী দুনিয়ায় তার মূল রোপন করতে পারে প্রাথমিকভাবে হৃদয় পরিবর্তনের জন্য নয়, খুব সাধারণভাবে

জনগণের কর্মপ্রক্রিয়ার অনুশীলনের জন্য। প্রকৃতপক্ষে, সত্যাগ্রহ আন্দোলন হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত, দার্শনিকভাবে, নৈতিকভাবে ও সংগঠিতভাবে পূর্ব নির্ধারিত নয়। অহিংস পদ্ধতি ও আত্ম বলিপ্রাপ্ত সহনশীলতা ও সহ্যশক্তি পশ্চিমী জনগণকে সমর্থ করতে পারে আন্দোলদের ক্ষেত্রে সামরিক মনোবৃত্তি ত্যাগ করে অহিংস পদ্ধতি আরোপ করতে। গান্ধি (১৯৪৬)- এর মতে সত্যাগ্রহ হল এমন একটি পদ্ধতি ও প্রবাহ যা জনগণকে শিক্ষিত করে, জনমত তৈরি করে যা অপ্রতিরুদ্ধ। হিংসা সেই প্রবাহকে বন্ধ করে দেয়, হিংসা ও শোষনের চক্রব্যূহ্য তৈরি করে এবং পরিশেষে হিংসা ও শোষণ মুক্তির প্রক্রিয়াকে স্তিমিত করে। গান্ধি (১৯৬১)- র মতে, সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য আনতে পারে না। যখন তাঁরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন, তখন তাঁরা রাষ্ট্রের মাধ্যেমে সাম্যকে বলবৎ করেন। রাষ্ট্র সব সময় জনগণের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হবে, রাষ্ট্র জনগণকে আদেশের মাধ্যমে বাধ্য করবে না। অহিংসার মাধ্যমেই অর্থনৈতিক সাম্য আনা সম্ভব। শোষিত জনগণ কখনই প্রভুত্বের বিষয়বস্তু হতে পারে না। শোষণ ও শাসন থেকে মুক্তি প্রক্রিয়ায় জনগণের অজ্ঞানতা দূর করা দরকার ও তাদেরকে শাসকদেরকে অসহযোগেতার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

গান্ধির (১৯৬১) মতে, ধনীরা কখনোই সম্পদ আত্মসাৎ ও কুক্ষিগত করে রাখতে পারে না সমাজে গরীবদের সহযোগিতা ছাড়া। এই জ্ঞান যদি তাদের মধ্যে প্রবেশ করানো ও প্রসারিত করা যায় তা হলে তারা শক্তিশালী হবে শিক্ষা লাভ করবে কি ভাবে নিজেদের মুক্ত করা যায়। ব্রায়ান ফে (১৯৭৫) মনে করেন যে, গণসমাজের ধারণার নিরিখে মুক্ত ও অ-দমনমূলক বা অ-নিপীড়নমূলক যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষামূলক গুণগত পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে দ্বন্দ নিরসনের জন্য সত্য, নৈতিকতা ও পৌরসামাজিক সংশ্লেষণ-এর কথা বলেছেন, যা অনেকের মতে সমালোচনার যোগ্য। এই পৌরসামাজিক সংশ্লেষণ (communitarian synthesis) – এর মাধ্যমে গান্ধি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদের বলিকাঠ থেকে ভারতীয় জনগণকে মুক্ত করার জন্য নয়, জাত ব্যবস্থায় অস্পৃশ্য জাতি গোষ্ঠীকে রক্ষা করা নয়, বরং ব্রাহ্মণ সম্পদায়কে রক্ষা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য (নন্দী ১৯৭৮)। গান্ধির তত্ত্ব একটা মরিচীকা বিশেষ। নন্দী (১৯৭৮)- এই মতামতের সাথে নন্দী (১৯৭০, ১৯৮৯)- এর ধ্যানধারণার যোগাযোগ পাওয়া যায়। নন্দীর মতো, গান্ধির রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে আধুনিক ভারতীয় রাজনীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সাধু-সন্ত প্রকৃতির রাজনীতি, নৈতিকতা ও অহিংসা আধুনিককালের গণতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে সমান্তরাল ভাবে চলতে পারে না। ভারতীয় রাজনীতি আমলাতন্ত্রের কাছে তার স্বয়ংক্রিয়তা হারিয়েছে। এই আমলাতন্ত্রে ক্রমোচ্চ (hierarchy) শ্রেণিবিন্যাস এর মধ্যে যা কিছু নূতন, যা কিছু সংহতিনাশক, যা কিছু খারাপ সেই সমস্ত কিছুকে নিজস্ব আধারে আবদ্ধ করে রাখা। রাজনীতির মুখ্যতা বা প্রাথমিকতা প্রমাণিত হয় এই মাধ্যমে যে, ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি তার বিশেষত্ব অর্জন করে কতকগুলো গুচ্ছ নিয়মকানুন সৃষ্টির প্রচেষ্টা থেকে। রাজনীতির এই প্রাথমিকতা রাজনীতির সূচক নির্ধারণ করে থাকে। ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির নির্মাণ ও বিনির্মাণ চারটি ভিন্ন পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যা রাজনীতির সূচককে নির্ধারণ করে। এই চারটি পর্বের মধ্যে তিনটি পর্ব হল প্রাক্-স্বাধীনতার। প্রথম পর্ব হল আত্মসংজ্ঞার রাজনীতি (politics of self- definition)। এই পর্বকে দুইটি বিষয়ের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়, তা হল ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে পাশ্চাত্য উপাদানের পরিপৃক্তকরণ (infusion) এবং ভারতীয় প্রবর শ্রেণির অভিন্নতা বা স্বকীয়তা। এটাই হল ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের রাজনীতি। দ্বিতীয় পর্বটি হল ব্যক্তি-যথার্থতার রাজনীতি (politics of self- affirmation)। এটা হিন্দু মতবাদের পুনরবতারের (reincarnation of

Hinduism) পর্ব, উদাহরণ হিসাবে এই পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন লেখাপত্র, আর্য সমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করা যায়। এই পর্বের গুরুত্বপূর্ণ মুখপাত্র হলেন রাজা রামমোহন রায়। তৃতীয় পর্ব হল স্বাতন্ত্র্যের রাজনীতি (politics of autonomy) এবং প্রবরবাদের রাজনীতি (politics of elitism) থেকে সরে আসার পর্ব, যা সূচিত হয় মহাত্মা গান্ধির মাধ্যমে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের উৎপত্তি ঘটেছিল বিদেশী সংস্কৃতি শাসনপ্রণালী ও রাজনীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, যেখানে স্বাতন্ত্র্যবাদ, পরিবেশবাদ, তৃণমূল স্তরে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, বিকেন্দ্রীকতাবাদ এবং বিরুদ্ধ রাষ্ট্রবাদ বা প্রতি-রাষ্ট্রবাদ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। এই তিন পর্বের তাৎপর্য হল এই যে, প্রাক-স্বাধীনোত্তর পর্বের এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি স্বাধীনোত্তর কালের গতানুগতিকার (banality) রাজনৈতিক সংস্কৃতি নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। আশীষ নন্দী মনে করেন যেমন ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা স্বাধীনতার পরও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে, তা হল গোষ্ঠী সচলতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা মুনাফার জন্য রাজনীতির সচেতন ব্যবহার। তাঁর মতে, ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য স্বাধীনতার পরও বর্তমান। এটা সম্ভব হয়েছে তিনটি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রবাহ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই তিনটি প্রবাহকে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সেগুলি হল- ১) জন রাজনীতির মাধ্যমে স্থানীয় এবং জেলাস্তরের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অগ্রগমণ ঘটে জাতীয় কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক স্তর পর্যন্ত; ২) রাজনীতি ও সমাজের বিভিন্ন উপ-ব্যবস্থার মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের উদ্ভব ও উন্নয়ণ, যেখানে রাজনীতি অতিরিক্ত চাহিদার চাপে তার নিজস্ব গতি বা তাজা ভাব হারিয়ে ফেলে বা রাজনীতি শুকিয়ে যায়; ৩) স্থানীয় রাজনীতির উপর কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রভাব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা তৃণমূল স্তর থেকে সংগঠিত স্বার্থের বিষয় নয়, যা কিনা কেন্দ্রীয় স্তরের প্রতি দায়বদ্ধ।

গান্ধির চিন্তাধারা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির নিরিখে গান্ধির ধর্ম সম্পৃক্ত রাজনীতি প্রাসঙ্গিক নয়। গান্ধির বহুত্ববাদী জনসমাজ ও বহুত্ববাদের পুরানো সংস্কৃতি থেকে নূতন করে পুনর্গঠনের উপযোগী বহুত্ববাদে স্থান পরিবর্তনের সাথে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের চার ধরনের পরিবর্তন। সংসর্গীকৃত। প্রথম পরিবর্তনটি হল রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের সাথে জনসাধারণের উন্নয়নকে অভিন্ন হিসাবে চিহ্নিত করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। দ্বিতীয় পরিবর্তনটি হল, রাষ্ট্রের ধর্ম নিরপেক্ষ বৌদ্ধিক প্রবাহকে জাতিসত্ত্বাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সহনশীলতার সাথে অভিন্ন হিসাবে চিহ্নিত করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। তৃতীয়টি পরিবর্তনটি হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে রাষ্ট্রের নিবিড় ও অদৃশ্য সম্পর্ক স্থাপন করা। চতুর্থ পরিবর্তনটি হল সভ্যতাগত পার্থক্যের বিষয়টিকে আত্মস্থ করা। এই পরিবর্তন থেকে উদ্ভুত মূলত দুই ধরনের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ফলাফল পরিলক্ষিত হয়- আধুনিক ভারতের কিছু অংশের মধ্যে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধারা প্রসঙ্গে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা এবং নূতন পরিবর্তনের সাথে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমন্বয় সাধন।

গান্ধির মতে, ধর্ম ও রাজনীতি এবং ধর্ম ও কর্ম সম্পৃক্ত। কর্ম ও রাজনীতি ধর্ম ও নৈতিকতা দ্বারা নির্ধারিত হবে। আসলে তিনি ধর্মকে মতাদর্শগত হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের কথা বলেছেন। ধর্মকে যদি মতাদর্শ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তা হলে ধর্ম নৈতিকতা বির্বজিত হতে বাধ্য। তাই, ধর্ম ও রাজনীতি, ধর্ম ও কর্ম, রাজনীতি ও নৈতিকতা এবং কর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কে গান্ধির ধারণা বিরোধী। আশীষ নন্দীর মতে, আধুনিক যুগে দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষ করে ভারতে কিছু বিশেষ ধরনের ঝোক বা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক ধর্মের দুইটি দিক পরিলক্ষিত হয়- বিশ্বাস ও মতবাদ বা ভাবতত্ত্ব। বিশ্বাস হিসাবে ধর্ম হল জীবন প্রণালী, যা এক রচনাত্মক নয়, দুই রচনাত্মক বা বহু রচনাত্মক। মতবাদ বা ভাবতত্ত্ব হিসাবে ধর্ম হল জাতীয়, উপ বা

আন্তঃর্জাতীয় বা শঙ্করজাতীয় শনাক্তকরণ, যেখানে জনগণ ধর্ম ব্যতিরেকে রাজনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক স্বার্থ নিয়ে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এখানে ধর্মকে মতবাদ বা ভাবতত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করা হয়। গান্ধি এই দুটিকে তফাৎ করতে পারেন নি। একটি চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টিকে দেখানো যেতে পারে।

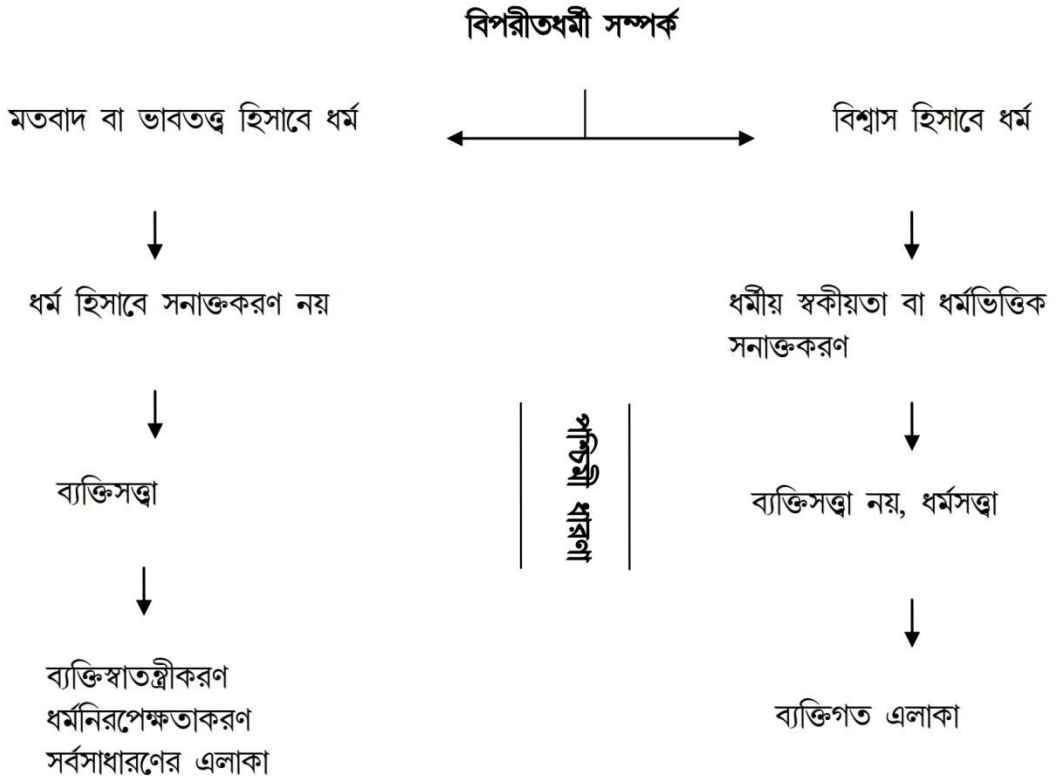

চিত্র - ৭

গান্ধির দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মনস্তত্ত্ব এবং তাঁর রাজনৈতিক কলা-কৌশল সাধুসুলভ স্লোগান ছাড়া কিছু নয়। ফ্রেডের মতে, মানুষের প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নয়। মানুষ কখনও তার দুঃখ-কষ্ট ভুলে অতীত অতিক্রম করতে পারে না। গান্ধি যে শোষক ও শোষিতের মধ্যে সম্পর্কের কথা বলেছেন তা ফ্যানন (১৯৬৭)- এর মতে শোষিতের মধ্যে শোষক অবস্থান করে এবং অহিংসার ভূমিকা ও শ্রেণি শত্রুকে ধ্বংস করা এটা যেন বেমানান। আমাদের নিজেদের মধ্যে ভূতকে আমরা করি বর্হিঃপ্রকাশিত হিংসার মাধ্যমে। একটা শোষণকারী ব্যবস্থা মূল্যবোধের সাথে জনগণের আত্মিকরণ ঘটে। গান্ধির দ্বন্দ নিরসনের তত্ত্ব শুধুমাত্র অহিংসার উপর গুরুত্ব আরোপ নয়, বরং আরো বেশি কিছু। গান্ধি অসহযোগিতা বা অপারস্পরিকতায় সচেতন থাকলেও তাঁর মতাদর্শ অনুযায়ী শূন্য- অঙ্কের প্রতিযোগিতা এবং ক্ষমতার জন্য অবিরাম অনুসন্ধান, নিয়ন্ত্রণ ও পুরুষত্ব এবং শোষিত ও শাসিতদের বাধ্য করা শোষণমূলক মূল্যবোধ সমূহকে আত্মিকরণ করতে, আর সেই কারণে

তারা শোষণকারী ও শাসনকারিদের অপসারিত করবে এবং এমন একটা নূতন ব্যবস্থা তৈরি করবে, যা পুরাতন নিয়ম ও আদর্শকে গুপ্তাকারে অনুসরণ করবে। সেই কারণে বলা যেতে পারে তাঁর অসহযোগের আন্দোলন ছিল দ্বৈত। মূলত তিনি শাসক এবং শোষণকারীদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন শোষিতদের রোষ থেকে। তিনি প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদের পথিক ছিলেন। এখানে আমরা আশীষ নন্দী ২০১৬ - এর মতামত অনুসরণ করে বলতে পারি যে, 'Gandhi acted as if he was aware that non-synergic systems, driven by zero-sum competition and search for power, power and masculinity, force the victims of oppression to internalize the norms of the system in which the older norms covertly prevail. So his concept of non-co-operation set a different goal for the victims; he stressed that the aim of the oppressed should be not to become a first class citizen in the world of oppression instead of a second or third class one, but to become the citizen of an alternative instead of a second or third class one, but to become the citizen of an alternative world where he can hope to win back his human authenticity. He thus becomes a non-player for the oppressors - one who plays a different game...' (Nandy 2016, p. 345).

গ্রন্থপঞ্জী:

1. Bondurant, Joan (1959), *Conquest of Violence: The German Philosophy of Conflict* (Bombay: Oxford University Press).
2. Bose, Nirmal Kr. (1948), *Selections from Gandhi* (Ahmedabad: Navajivan).
3. Burnham, Walter Dean (1978), 'Thoughts on the "Governability Crisis" in the West', *Washington Review of Strategic and International Studies* (July 1978).
4. Desai, D.G. (1953), *The Diary of Mahadev Desai*, Vol. 1 (Ahmedabad: Navajivan).
5. Dewey, John (1966), *Democracy and Education* (New York: Free Press).
6. Duncan, Ronald (1951), *Selected Writings of Mahatma Gandhi* (Boston: Beacon Press).
7. Fanon, Frantz (1967), *The Wretched of the Earth* (Harmondsworth: Penguin).
8. Fanon, Frantz (1967), *Black Skin, White Masks* (New York: Grove Press).
9. Fay, Brian (1975), *Social Theory and Political Practice* (London: george Allen and Unwin).
10. Gandhi, M.K. (1920), *Young India* (11th August).
11. Gandhi, M.K. (1920), *Young India* (28th July).
12. Gandhi, M.K. (1921), *Young India* (October 12).
13. Gandhi, M.K. (1921), *Young India* cited in Raghavan Iyer, *Ihe Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi* (New York: OUP, 1973).
14. Gandhi, M.K. (1922), *Ethical Religion* (translated by A. Ramaiyer) (Madras: S. Ganesan).
15. Gandhi, M.K. (1924), *Young India* (17th July).
16. Gandhi, M.K. (1925), *Young India* (8th October).
17. Gandhi, M.K. (1925), *Young India* (March).
18. Gandhi, M.K. (1926), *Young India* (23rd September).
19. Gandhi, M.K. (1927), *Young India* (2nd January).

20. Gandhi, M.K. (1929), *Young India* (29th August).
21. Gandhi, M.K. (1932), *India's Case for Swaraj* (Yeshanand).
22. Gandhi, M.K. (1938), *Hind Swaraj* (Ahmedabad: Navajivan).
23. Gandhi, M.K. (1940), *Harijan* (1st September).
24. Gandhi, M.K. (1942), *Harijan* (1st february).
25. Gandhi, M.K. (1942), *Nonviolence in Peace and War* (Ahmedabad: Navajivan).
26. Gandhi, M.K. (1946), *Harijan* (3rd March).
27. Gandhi, M.K. (1946), *Harijan* (March).
28. Gandhi, M.K. (1949), *For the Pacifists* (Ahmedabad: Navajivan).
29. Gandhi, M.K. (1950), *Hindu Dharma* (Ahmedabad: Navajivan).
30. Gandhi, M.K. (1954), *Sarvodaya* (Ahmedabad: Navajivan).
31. Gandhi, M.K. (1956), *Towards Lasting Peace* (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan).
32. Gandhi, M.K. (1958), *Satyagraha* (Ahmedabad: Navajivan).
33. Gandhi, M.K. (1959), *My Socialism* (Ahmedabad: Navajivan).
34. Gandhi, M.K. (1961), *Democracy: Real and Deceptive* (Ahmedabad: Navajivan).
35. Habermas, Jurgen (1970), *Toward a Rational Society* (Boston: Beacon Press).
36. Habermas, Jurgen (1975), *Legitimation Crisis* (Boston: Beacon Press).
37. Hume, R.E. (1921), *The Thirteen Upanishads* (London: Oxford Press).
38. Huxley, Aldous (1946), *Science, Liberty and Peace* (New York: Harper Brothers).
39. Kant, E. (1963), 'Perpetual Peace' in L.W. Beck (ed.), *Kant on History* (New York).
40. Kothari, Rajni (1970), *Politics in India* (London: Little Brown).
41. Morris-Jones (1970), 'Mahatma Gandhi - Political Philosopher ?', *Political Studies* (February).
42. Morris-Jones, W.H. (1963), 'India's Political Idioms' in Cyril Henry Philips (ed.) *Politics and Society in India* (London: George Allen and Unwin)
43. Nandy, Ashis (1970), 'The Culture of Indian Politics', *Journal of Asian Studies* (Vol. 30).
44. Nandy, Ashis (1978), 'Oppression and Human Liberation: Towards a Third Utopia', *Alternatives* (Vol. 4).
45. Nandy, Ashis (1978), 'The Oppression and Human Liberation: Towards a Third World Utopia', *Alternatives* (Vol. 4).
46. Nandy, Ashis (1989), 'The Political Culture of the Indian State', *Dacdalus* (Vol. 118: No. 4).
47. Nandy, Ashis (1997), 'A Critique of Modernist Secularism' in Sudipta Kaviraj (e.), *Politics in India* (New Delhi: OUP).
48. Nandy, Ashis (2016), 'Oppression and Human Liberation: Towards a Post-Gandhian Utopia', *Political Thought in Modern India* (New Delhi: Sage).
49. Orwell, George (1949), 'Reflections on gandhi', *Partisan Review* (Vol. 16).
50. Pateman, Carole (1975), 'Sublimation and reification: Locke, Wolin and the Liberal Democratic Conception of the Political', *Politics and Society* (Vol. n.f.: No. n.f.).
51. Pyarelal (1958), *Mahatma Gandhi: The Last Phase*, Vol. 2 (Ahmedabad: Navajivan).

52. Radhakrishnan, S. (1939), *Indian Religion and Western Thought* (London: Oxford University Press).
53. Schumpeter, Joseph (1950), *Capitalism, Socialism and Democracy* New York: Harper and Row).
54. Schweitzer, Albert (1936), *Indian Thought* (Boston: Beacon Press).
55. Tendulkar, D.G. (1951-1954), *Mahatma*, Vol. 4 (Bombay: Javeri and Tendulkar).
56. Tendulkar, D.G. (1951-54), *Mahatma*,Vol. 5 (Bombay: Jhaveri and Tendulkar).
57. Unger, Roberto (1965), *Knowledge and Politics* (New York: Free Press).
58. Wolin, Sheldon (1981), 'The People's of Two Bodies', *Democracy* (January).